

ভূমিকা

কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে —

কেহ বা খেলার সাথী, কেহ কৌতূহলী,

কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।

আজ যারা কাছে আছ এ নিঃশ্ব প্রহরে,

পরিপ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিশ্বেজ আলোয়

তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,

খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে।

তোমরা পথিকবন্ধু,

যেমন রাত্রির তারা

অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

উদয়ন, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

এ দুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি

এই মহামন্ত্রখানি,

চরিতার্থ জীবনের বাণী।

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার

মধুরসে ক্ষয় নাই তার।

তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—

সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর

ব'লে যাব তোমার ধূলির

তিলক পরেছি ভালে,

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,

এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

উদয়ন, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

দুই

পরম সুন্দর

আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।

অসীম অরূপ

রূপে রূপে স্পর্শমণি

রসমূর্তি করিছে রচনা,

প্রতিদিন

চিরনূতনের অভিষেক

চিরপুরাতন বেদীতলে।

মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়

ধরণীর উত্তরীয়

বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।

আকাশের হৃৎস্পন্দন

পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।

প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি

বন হতে বনে।

পাখিদের অকারণ গান

সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।

সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ

অমৃতের অর্থ দেয় তারে,

মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

উদয়ন, ১২ জানুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর

৩

নির্জন রোগীর ঘর।

খোলা দ্বার দিয়ে

বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।

শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা

চলেছে মন্বরগতি

শৈবালে দুর্বলশ্রোত নদীর মতন।

মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস

শস্যহীন মাঠে।

মনে পড়ে কতদিন

ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা

কমহীন প্রৌঢ় প্রভাতের

ছায়াতে আলোতে

আমার উদাস চিত্রা দেয় ভাসাইয়া

ফেনায় ফেনায়।

স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা

জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,

যুথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।

আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের

ঘোমটায় গুষ্ঠিত আলাপে

গুঞ্জরিত বাঁকা পথে আশ্রবনচ্ছায়ে
কোকিল কোথায় ডাকে ক্ষণে ক্ষণে নিভৃত শাখায়,
ছায়ায় কুণ্ঠিত পল্লীজীবনযাত্রার
রহস্যের আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে।
পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেখেতে পূর্ণ হয়ে যায়
ধরণীর প্রতিদান বৌদ্ধের দানের,
সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।
আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা,
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতীরূপে প্রথম মানুষ
মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।
মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে;
ভাষা নাই, ভাষা নাই;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

উদয়ন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর, পূর্বপাঠ: ৭ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর,
১৯৪০

8

ঘন্টা বাজে দূরে।

শহরের অভ্যন্তরে আশ্রয়প্রার্থী

মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল,

আতপ্ত মাঘের বৌদ্ধে অকারণে ছবি এল চোখে

জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

গ্রামগুলি গাঁথে গাঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে

নদীর পাড়ির ‘পর দিয়ে।

প্রাচীন অশ্বতলা,

খেয়ার আশ্রয় লোক ব’সে

পাশে রাখি হাটের পসরা।

গঞ্জের টিনের চালাঘরে

গুড়ের কলস সারি সারি,

চেটে যায় ঘ্রাণলুপ্ত পাড়ার কুকুর,

ভিড় করে মাছি।

রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি

পাটের বোঝাই ভরা,

একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন

আড়তের আঙিনায়।

বাঁধা-খোলা বলদেরা

রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে,
লেজের চামর হানে পিঠে।
সর্ষে আছে স্থূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলেনৌকো এল ঘাটে,
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি।
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।
আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের খেতে।
অদূরে বনের উর্ধ্ব মন্দিরের চূড়া
ঝলিছে প্রভাত-রৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিবেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।
মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দুঃপহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।

জ্যোৎস্নায় চিহ্ন জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্যতীরে-তীরে,
ঝুঁকি বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তরী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে শুক্ল বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।
পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা,
দূর প্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাস্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ-বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে বুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কডু বহু দূরে চলে নদীর বেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা একসারি।

জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেলা।

গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে;

তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম,

নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া।

রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।

ইদারায় টানা জল

নালা বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে

ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।

ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম

পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।

মধ্যাহ্ন আবিষ্টি করে একটানা সুর।

পথে-চলা এই দেখাশোনা

ছিল যাহা ক্ষণচর

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,

চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;

এই-সব উপেক্ষিত ছবি

জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা

দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

উদয়ন, মূলপাঠ: ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

৫

মুক্তবাতায়নপ্রাপ্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তরু প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আস্থান;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকৃতি,
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ,
করে থাকে চুপ,
বলে, আমি আনন্দিত— ছন্দ যায় আমি—
বলে, ধন্য আমি।

উদয়ন, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

৬

অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাভুর নীলিমা।
অরণ্য তাহারি তলে উর্ধ্ব বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
মাঘের তরুণ বৌদ্ধ ধরণীর ‘পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।
এ কথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে।
উদয়ন, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

৭

হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে,
গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে
অন্তরে প্রবেশ করে,
হরণ করিতে থাকে জীবনের গৌরবের রূপ
কালিমার আক্রমণে হার মানে মন।
এ পরাভবের লজ্জা এ অবসাদের অপমান
যখন ঘনিষে ওঠে সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা-আঁকা;
আকাশের যেন কোন্ দূর কেন্দ্র হতে
উঠে ধ্বনি “মিথ্যা মিথ্যা” বলি।
প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহদুর্গের শিখরে।

উদয়ন, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

৮

একা ব'সে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।
পথরেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তম্ভ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।
সেখা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূৰ্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।

উদয়ন, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

৯

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে

আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে,

সূর্য তারা ল'য়ে

যুগযুগান্তের পরিমাপে।

অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি

ক্ষুদ্র অধিকণা নিয়ে

এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।

প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি

দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,

ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,

ম্লথ হয়ে এল ধীরে

সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।

দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত

ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের

রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।

দেখিলাম চাহি

শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে

নটরাজ নিস্তরু একাকী।

উদয়ন, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

অলস সময়-ধারা বেয়ে

মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।

সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে।

কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে

সুদীর্ঘ অতীতে

জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।

এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,

এসেছে মোগল;

বিজয়রথের চাকা

উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।

শূন্যপথে চাই,

আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।

নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো

যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো।

আরবার সেই শূন্যতলে

আসিয়াছে দলে দলে

লৌহবাঁধা পথে

অনলনিশ্বাসী রথে

প্রবল ইংরেজ,

বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,

কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল;

জানি তার পণ্যবাহী সেনা

জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে

দেখি সেথা কলকলরবে

বিপুল জনতা চলে

নানা পথে নানা দলে দলে

যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে

জীবনে মরণে।

ওরা চিরকাল

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,

ওরা মাঠে মাঠে

বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

ওরা কাজ করে

নগরে প্রান্তরে।

রাজহুত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,

জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি

শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

ওরা কাজ করে

দেশে দেশান্তরে,

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,

পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।

গুরুগুরু গর্জন গুন্‌গুন্‌ স্বর

দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।

দুঃখ সুখ দিবসরজনী

মদ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-‘পরে

ওরা কাজ করে।

উদয়ন, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাগুনদিনের,

আজ এই সম্মানহীনের

দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা

যেথা আমি সাথিহীন একা

উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে

শস্যহীন মরুময় তীরে।

যেখানে এ ধরণীর প্রফুল্ল প্রাণের কুঞ্জ হতে

অনাদৃত দিন মোর নিরুদ্দেশ শ্রোতে

ছিন্নবৃন্ত চলিয়াছে ভেসে

বসন্তের শেষে।

তবুও তো কৃপণতা নাই তব দানে,

যৌবনের পূর্ণ মূল্য দিলে মোর দীপ্তিহীন প্রাণে,

অদৃষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার —

ঘুচাইলে অবসাদ তার;

জানাইলে চিত্তে মোর লভি অনুক্ষণ

সুন্দরের অভ্যর্থনা, নবীর আসে নিমন্ত্রণ।

উদয়ন, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর

দ্বার খোলা ছিল মনে, অসতর্ক সেথা অকস্মাৎ
 লেগেছিল কী লাগিয়া কোথা হতে দুঃখের আঘাত;
 সে লজ্জায় খুলে গেল মর্মতলে প্রচ্ছন্ন যে বল
 জীবনের নিহিত সম্বল।
 উর্ধ্ব হতে জয়ধ্বনি
 অন্তরে দিগন্তপথে নামিল তখনি,
 আনন্দের বিচ্ছুরিত আলো
 মুহূর্তে আঁধার-মেঘ দীর্ণ করি হৃদয়ে ছড়ালো।
 ক্ষুদ্র কোটরের অসম্মান
 লুপ্ত হল, নিখিলের আসনে দেখিনু নিজ স্থান,
 আনন্দে আনন্দময়
 চিত্ত মোর করি নিল জয়,
 উৎসবের পথ
 চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ।
 দুঃখ-হান্না গ্লানি যত আছে,
 ছায়া সে, মিলালো তার কাছে।

উদয়ন, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
 নির্ঝরির প্রলাপকল্লোলে,
 অজানা শিখর হতে
 সহসা বিস্ময় বহি আনি
 ক্রান্তিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
 লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
 বাতাসেরে করি ধৈর্যহারা,
 পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
 অভাবিত রহস্যের ভাষা,
 চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
 তারি মধ্যে মুক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।
 আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সাত্ত্বনার স্তব্ধতায়
 রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
 চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শক্তিতে
 মিলেছে সে সহজ মিলনে,
 তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
 পূজারত অরণ্যের পুষ্প অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।
 উদয়ন, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
 স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
 যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
 করস্পর্শ দিয়ে।

এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
 সর্বাস্থে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।
 বাক্যহীন প্রাণীলোক-মাঝে
 এই জীব শুধু
 ভালো মন্দ সব ভেদ করি
 দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে;
 দেখেছে আনন্দে যাবে প্রাণ দেওয়া যায়
 যাবে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম,
 অসীম চৈতন্যলোকে
 পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।
 দেখি যবে মূক হৃদয়ের
 প্রাণপণ আত্মনিবেদন
 আপনার দীনতা জানায়ে,
 ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
 আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে;

ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা

বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,

আমারে বুঝায়ে দেয়— সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়।

উদয়ন, ৭ই পৌষ, ১৩৪৭ - সকাল, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪০

খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে,
বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।

আপনার দেহটারে অসংশয়ে করেছি বিশ্বাস,
জরার সুযোগ পেয়ে নিজেই সে করে পরিহাস,
সকল কাজেই দেখি কেবলি ঘটায় বিপর্যয়,
আমার কর্তৃত্ব করে ক্ষয়;

সেই অপমান হতে বাঁচাতে যাহারা

অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা,

পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম না'ই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।

তাহারা দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়,
ভুলায়ে রাখিছে তারা দুর্বল প্রাণের পরাজয়;

এ কথা স্বীকার তারা করে

খ্যাতি প্রতিপত্তি যত সুযোগ্য সক্ষমদের তবে;

তাহারাই করিছে প্রমাণ

অক্ষমের ভাগ্যে আছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সেই দান।

সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়,

কিছু সে সহ্য না অপচয়;

সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্য প্রেমের অর্ঘ্য আনে

অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।

উদয়ন, ৯ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

দিন পরে যায় দিন, শুরু বসে থাকি;
 ভাবি মনে, জীবনের দান যত কত তার বাকি
 চুকায়ে সঞ্চয় অপচয়।
 অয়ত্তে কী হয়ে গেছে ক্ষয়,
 কী পেয়েছি প্রাপ্য যাহা, কী দিয়েছি যাহা ছিল দেয়,
 কী রয়েছে শেষের পাথেয়।
 যারা কাছে এসেছিল, যারা চলে গিয়েছিল দূরে,
 তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্‌ সুরে।
 অন্যমনে করে চিনি নাই,
 বিদায়ের পদধ্বনি প্রাণে আজি বাজিছে বৃথাই।
 হয়তো হয় নি জানা ক্ষমা করে কে গিয়েছে চলে
 কথাটি না ব'লে।
 যদি ভুল করে থাকি তাহার বিচার
 ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রব না আমি আর।
 কত সূত্র ছিন্ন হল জীবনের আশ্রয়ময়,
 জোড়া লাগাবারে আর হবে না সময়।
 জীবনের শেষপ্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি
 মোর কোনো অসম্মান তাহে ক্ষতচিহ্ন দেয় যদি,
 আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে,

এ কথাই ভাবি বারে বারে।

উদয়ন, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

যখন এ দেহ হতে রোগে ও জরায়
 দিনে দিনে সামর্থ্য ঝরায়,
 যৌবন এ জীর্ণ নীড় পিছে ফেলে দিয়ে যায় ফাঁকি,
 কেবল শৈশব থাকে বাকি।
 বদ্ধ ঘরে কর্মক্ষুর সংসার—বাহিরে
 অশক্ত সে শিশুচিত্ত মা খুঁজিয়া ফিরে।
 বিতহারা প্রাণ লুরু হয়
 বিনা মূল্যে স্নেহের প্রশ্রয়
 কারো কাছে করিবারে লাভ,
 যার আবির্ভাব
 ক্ষীণজীবিতেরে করে দান
 জীবনের প্রথম সম্মান।
 “থাকো তুমি” মনে নিয়ে এইটুকু চাওয়া
 কে তারে জানাতে পারে তার প্রতি নিখিলের দাওয়া
 শুধু বেঁচে থাকিবার।
 এ বিস্ময় বারবার
 আজি আসে প্রাণে
 প্রাণলক্ষ্মী ধরিত্রীর গভীর আস্থানে
 মা দাঁড়ায় এসে

যে মা চিরপুরাতন নৃতনের বেশে।

উদয়ন, ২১ জানুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

ফসল কাটা হলে সারা মাঠ হয়ে যায় ফাঁক;
 অনাদরের শস্য গজায়, তুচ্ছ দামের শাক।
 আঁচল ভরে তুলতে আসে গরিব-ঘরের মেয়ে,
 খুশি হয়ে বাড়িতে যায়, যা জোটে তাই পেয়ে।
 আজকে আমার চাষ চলে না, নাই লাঙলের বালাই;
 পোড়ো মাঠের কুঁড়েমিতে মন্থর দিন চালাই।
 জমিতে রস কিছু আছে, শক্ত যায় নি আঁটি;
 ফলায় না সে ফল তবুও সবুজ রাখে মাটি।
 শ্রাবণ আমার গেছে চলে, নাই বাদলের ধারা;
 অঘ্রান সে সোনার ধানের দিন করেছে সারা।
 চৈত্র আমার রোদে পোড়া, শুকনো যখন নদী,
 বুনো ফলের ঝোপের তলায় ছায়া বিছায় যদি,
 জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয় নি ফাঁকি,
 শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।

উদয়ন, ১০ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

দিদিমণি—

অফুরান সাত্ত্বনার খনি।

কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ

মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।

কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি

সেবার মাধুর্যে ছায়া নাই দেয় আনি।

এ অখণ্ড প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি,

রচিতোছে শান্তির মণ্ডলী;

ক্ষিপ্ত হস্তক্ষেপে

চারি দিকে স্বস্তি দেয় ব্যাপে;

আশ্বাসের বাণী সুমধুর

আবসাদ করি দেয় দূর।

এ স্নেহমাধুর্যধারা

অক্ষম রোগীকে ঘিরে আপনার রচিতোছে কিনারা;

অবিরাম পরশ চিত্তার

বিচিত্র ফসলে যেন উর্বর করিছে দিন তার।

এ মাধুর্য করিতে সার্থক

এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।

অবাক হইয়া তারে দেখি,

ৰোগীৰ দেহেৰ মাকৈ অনন্ত শিশুৱে দেখেছে কি।

উদয়ন, ২ জানুৱাৰি, ১৯৪১

বিশুদ্ধদা—

দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু, দুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা,

বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চিত্ত তার

সর্বদেহে তৎপরতা করিছে বিস্তার।

তন্দ্রার আড়ালে

বোগক্লিষ্ট ক্লান্ত রাত্রিকালে

মূর্তিমান শক্তির জাগ্রত রূপ প্রাণে

বলিষ্ঠ আশ্বাস বহি আনে,

নির্নিমেষ নক্ষত্রের মাঝে

যেমন জাগ্রত শক্তি নিঃশব্দ বিরাজে

অমোঘ আশ্বাসে

সুপ্ত রাতে বিশ্বের আকাশে।

যখন শুধায় মোরে, দুঃখ কি রয়েছে কোনোখানে

মনে হয়, নাই তার মানে—

দুঃখ মিছে ভ্রম,

আপন পৌরুষে তারে আপনি করিব অতিক্রম।

সেবার ভিতরে শক্তি দুর্বলের দেহে করে দান

বলের সম্মান।

উদয়ন, ৯ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

চিরদিন আছি আমি অকেজোর দলে;
 বাজে লেখা, বাজে পড়া, দিন কাটে মিথ্যা বাজে ছলে।
 যে গুণী কাটাতে পারে বেলা তার বিনা আবশ্যকে
 তারে “এসো এসো” ব’লে যন্ত্র ক’রে বসাই বৈঠকে।
 কেজো লোকদের করি ভয়,
 কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে শক্ত করে বেঁধেছে সময়—
 বাজে খরচের তরে উদ্বৃত্ত কিছুই নেই হাতে,
 আমাদের মতো কুঁড়ে লজ্জা পায় তাদের সাক্ষাতে।
 সময় করিতে নষ্ট আমরা ওস্তাদ,
 কাজের করিতে ক্ষতি নানামতো পেতে রাখি ফাঁদ।
 আমার শরীরটা যে ব্যস্তদের তফাতে ভাগায়—
 আপনার শক্তি নেই, পরদেহে মাশুল লাগায়।
 সরোজদাদার দিকে চাই—
 সব তাতে রাজি দেখি, কাজকর্ম যেন কিছু নাই,
 সময়ের ভাণ্ডারেতে দেওয়া নেই চাবি,
 আমার মতন এই অক্ষমের দাবি
 মেটাবার আছে তার অক্ষুণ্ণ উদার অবসর,
 দিতে পারে অকৃপণ অক্লান্ত নির্ভর।
 দ্বিপ্রহর রাত্রিবেলা স্তিমিত আলোকে

সহসা তাহাৰ মূৰ্তি পড়ে যবে চোখে

মনে ভাবি, আশ্বাসেৰ তৰী বেয়ে দূত কে পাঠালে,

দুৰ্যোগেৰ দুঃস্বপ্ন কাটালে।

দায়হীন মানুষেৰ অভাবিত এই আবিৰ্ভাব

দয়াহীন অদৃষ্টেৰ বন্দীশালে মহামূল্য লাভ।

উদয়ন, ৯ জানুৱাৰি, ১৯৪১ - সকাল

নগাধিরাজের দূর নেবু-নিকুঞ্জের

রসপাত্রগুলি

আনিল এ শয্যাতে

জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা,

অজানা নিব্বরিণীর

বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার

হিরণ্ময় লিপি,

সুনিবিড় অরণ্যবীথির

নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত

স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি।

বোগপঙ্গু লেখনীর বিরল ভাষার

ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার।

শান্তিনিকেতন, ২৫ নভেম্বর, ১৯৪০

২৩

নারী তুমি ধন্যা—

আছে ঘর, আছে ঘরকন্না।

তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।

সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক।

নিযে এসো শুশ্রুষার ডালি,

স্নেহ দাও ঢালি।

যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান,

নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।

সৃষ্টিবিধাতার

নিযেছ কর্মের ভার,

তুমি নারী

তাঁহারি আপন সহকারী।

উন্মুক্ত করিতে থাকো আরোগ্যের পথ,

নবীন করিতে থাকো জীর্ণ যে-জগৎ,

শ্রীহারা যে তার ‘পরে তোমার ধৈর্যের সীমা নাই,

আপন অসাধ্য দিয়ে দয়া তব টানিছে তারাই।

বুদ্ধিভ্রষ্ট অসহিষ্ণু অপমান করে বারে বারে,

চক্ষু মুছে ক্ষমা কর তারে।

অকৃতজ্ঞতার দ্বারে আঘাত সহিছ দিনরাতি,

লও শির পাতি।

যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে,

প্রাণলক্ষী ফেলে যাবে আবর্জনা-মাঝে,

তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,

তার লাঞ্ছনার তাপ শ্লিথ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।

দেবতারে যে পূজা দেবার

দুর্ভাগারে কর দান সেই মূল্য তোমার সেবার।

বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীৰ্যে বহ চুপে চুপে

মাধুরীর রূপে।

দ্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিরূপ বিকৃত,

তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।

উদয়ন, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে,
রচে শিল্প শৈবালের দলে।

মর্যাদা নাইকো তার, তবু তাহে রয়
জীবনের স্বল্পমূল্য কিছু পরিচয়।

উদয়ন, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

২৫

বিরাট মানবচিন্তে

অকথিত বাণীপুঞ্জ

অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে

মহাশূন্যে নীহারিকাসম।

সে আমার মনঃসীমানার

সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে

আকারে হয়েছে ঘনীভূত,

আবর্তন করিতেছে আমার রচনাক্ষপথে।

উদয়ন, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০ - সকাল

এ কথা সে কথা মনে আসে,
 বর্ষাশেষে শরতের মেঘ যেন ফিরিছে বাতাসে।
 কাজের বাঁধনহারা শূন্যে করে মিছে আনাগোনা;
 কখনো রূপালি আঁকে, কখনো ফুটায়ে তোলে সোনা।
 অদ্ভুত মূর্তি সে রচে দিগন্তের কোণে,
 বেখার বদল করে পুনঃ পুনঃ যেন অন্যমনে।
 বাষ্পের সে শিল্পকাজ যেন আনন্দের অবহেলা—
 কোনোখানে দায় নেই, তাই তার অথহীন খেলা।
 জাগার দায়িত্ব আছে, কাজ নিয়ে তাই ওঠাপড়া।
 ঘুমের তো দায় নেই, এলোমেলো স্বপ্ন তাই গড়া।
 মনের স্বপ্নের ধাত চাপা থাকে কাজের শাসনে,
 বসিতে পায় না ছুটি স্বরাজ-আসনে।
 যেমনি সে পায় ছাড়া খেয়ালে খেয়ালে করে ভিড়,
 স্বপ্ন দিয়ে রচে যেন উড়ুক্ষু পাখির কোন্ নীড়।
 আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ—
 স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।
 তাহারে দমনে রাখে, ধ্রুব করে সৃষ্টির প্রণালী
 কর্তৃষ্ণ প্রচণ্ড বলশালী।
 শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,

অধৰাকে ধৰা।

উদয়ন, ২৩ জানুৱাৰি, ১৯৪১ - দুপুৰ

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে
 সেই জালে ধরা পড়ে
 অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
 আগোচরে মনের গহনে।
 নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।
 মূল্য তার থাকে যদি
 দিনে দিনে হয় তাহা জানা
 হাতে হাতে ফিরে।
 অকস্মাৎ পরিচয়ে বিস্ময় তাহার
 ভুলায় যদি বা,
 লোকালয়ে নাই পায় স্থান,
 মনের সৈকততটে বিকীর্ণ সে রহে কিছুকাল,
 লালিত যা গোপনের
 প্রকাশ্যের অপমানে
 দিনে দিনে মিশায় বালুতে।
 পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিত্যক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা
 যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অখ্যাতের দান
 সাহিত্যের ভাষা-মহাদীপে
 প্রাণহীন প্রবালের মতো।

উদয়ন, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

মিলের চুম্বকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে
 অকেজো অলস বেলা ভরে ওঠে শেলাইয়ের কাজে।
 অর্থভরা কিছুই-না চোখে ক'রে ওঠে ঝিল্মিল
 ছড়াটার ফাঁকে ফাঁকে মিল।
 গাছে গাছে জোনাকির দল
 করে ঝলমল;
 সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আঁধারেতে
 টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে।
 মেঠো গাছে ছোটো ছোটো ফুলগুলি জাগে;
 বাগান হয় না তাহে, রঙের ফুটকি ঘাসে লাগে।
 মনে থাকে, কাজে লাগে, সৃষ্টিতে সে আছে শত শত;
 মনে থাকবার নয়, সেও ছড়াছড়ি যায় কত।
 ঝরনায় জল ঝ'রে উর্বরা করিতে চলে মাটি;
 ফেনাগুলো ফুটে ওঠে, পরস্পরে যায় ফাটি ফাটি।
 কাজের সঙ্গেই খেলা গাঁথা—
 ভার তাহে লঘু রয়, খুশি হন সৃষ্টির বিধাতা।

উদয়ন, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১ - সকাল

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ,
 মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আশ্বাদ!
 দুঃসহ দুঃখের দিনে
 অক্ষত অপরাজিত আশ্বারে লয়েছি আমি চিনে।
 আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
 সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি দুর্বল পরাভব।
 মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হই নি বঞ্চিত,
 তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।
 জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
 তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞমনে।
 উদয়ন, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪১ - বিকাল

৩০

ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রহি যত যায় স্থলি
প্রহরের কর্মজাল হতে। দিন দিল জলাঞ্জলি
খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার
সোনার ঐশ্বর্য তার
অন্ধকার আলোকের সাগরসংগমে।
দূর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশব্দে প্রণমে।
চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
গভীর ধানের তলে আপনার বাহ্য পরিচয়
করিতে মগন।
নক্ষত্রের শান্তিক্ষেত্র অসীম গগন
যেথা ঢেকে রেখে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সত্তারে,
সেখায় করিতে লাভ সত্য আপনারে
খেয়া দেয় রাত্রি পারাবারে।

উদয়ন, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ - দুপুর

৩১

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল,
বিদায়দিনের-পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্ভ সূর্যাস্ত-আভার;
সময় যাবার
শান্ত হোক, শুষ্ক হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সন্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসম্ভারে।
নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ,
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ।

৭ ও ১৮ পৌষ -মধ্যে, ১৩৪৭, ২২। ১২। ৪০- ২। ১। ৪১

৩২

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি তার সাথে আমার আশ্বাস ভেদ নাই
এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যশ্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

৭ পৌষ, ১৩৪৭

৩৩

এ আন্নির আৱৰণ সহজে স্থলিত হয়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুর্ততার স্তব্ধ উর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।

উদয়ন, ১১ মাঘ, ১৩৪৭ - সন্ধ্যা